ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪১
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৫

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি : একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল*

[**সারসংক্ষেপ :** *৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা হতে মদীনায় হিজরাতের পর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ স.-এর নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মদীনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ স. এ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক পরিক্রমা শুরু করেন। সনদ বহির্ভূত গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে সনদভুক্ত পক্ষসমূহের আচরণ কী হবে তিনি এ সনদে তা সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেন। এর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ স. বিভিন্ন দেশের শাসকগণের নিকট ইসলামের আহ্বান প্রেরণ করা, যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণের রূপরেখা নির্ধারণ করা, বাহ্যত পরাজয়মূলক হওয়ার পরও শান্তির স্বার্থে সন্ধি সম্পাদন করা, ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে শত্রুরাষ্ট্রে অভিযান প্রেরণ করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির রূপরেখা প্রদান করেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ হতে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে খুলাফায়ে রাশিদীন রাসূলুল্লাহ স.-এর বৈদেশিক নীতির প্রায়োগিক পরিপূর্ণতা দান করেন। উমাইয়া-আব্বাসীয় সাম্রাজ্য যেমন ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না তেমনি তাদের অনুসৃত বৈদেশিক নীতিও ইসলামী হুকুম-আহকাম বা আদর্শজাত ছিল না। কিন্তু এ সকল রাজবংশের কার্যক্রমকে উপজীব্য করে প্রায়শ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে নেতিবাচক সমালোচনা করা হয়। অনেক সমালোচক আবার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত সময়কালের [৬২২-৬৬১ খ্রি] বৈদেশিক নীতির অবস্থিতি অস্বীকার করেন। তারা দাবি করেন, আধুনিক পাশ্চাত্যই প্রথম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছে এবং এ জন্য সুস্পষ্ট নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর আগে পৃথিবীতে বৈদেশিক বা পররাষ্ট্রবিষয়ক কোনো নীতি ছিল না। কেননা তখন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কোনো যোগাযোগ বা সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বলা বাহুল্য, এ দাবি সর্বৈব অসত্য এবং ভিত্তিহীন। কারণ বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা উদ্ভবের অনেক আগে থেকে পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিলো। এ জন্য গোড়া থেকেই তারা প্রয়োজনীয় নীতিমালা নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। ইসলামের সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ স.-এর আবির্ভাবের পর রাষ্ট্রসমূহের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব ধারা সূচিত হয়েছিলো। খুলাফায়ে রাশিদীন এ আদর্শকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। অন্যান্য সকল বিষয়ের মতো ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির বিষয়টিও বাস্তব রূপ লাভ করেছিল আল-কুরআনের মূলনীতি ও আল্লাহর রাসূল স.-এর নির্দেশনার ভিত্তিতে। আলোচ্য প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ স. ও খলীফাগণের মদীনা রাষ্ট্রে অনুসৃত বৈদেশিক নীতি উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সমালোচকদের সমালোচনার অসারতা প্রমাণের সাথে সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।]*

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০

ইসলামী রাষ্ট্র

সাধারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী নির্দিষ্ট জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, পূর্ণাঙ্গ সরকার ও সার্বভৌমত্বই হলো রাষ্ট্রের মৌল উপাদান ও লক্ষণ।[১] জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা, যার আরবি পরিভাষা হচ্ছে দাওলাহ, তা ইউরোপের সার্বভৌমত্বের (সিয়াদাহ) ধারণার মতই সাম্প্রতিক ধারণা ও পরিভাষা। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির সাথে জাতি-রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা সম্পৃক্ত এবং সার্বভৌমত্বের ধারণাটি ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী রাষ্ট্র-দার্শনিক জ্যাঁ বোদাঁ (Jean Bodin) (১৫৩০-৯৬ খ্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত। এ কারণে এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, রাষ্ট্রের পরিভাষাটি যেমন আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়নি, তেমনি রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়েও এ পরিভাষাটি প্রচলিত ছিল না।[২] প্রথম যুগের ফকীহগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বুঝাতে খিলাফত বা ইমামত শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। হিজরী সপ্তম শতকের প্রথম দিকে দাওলাহ পরিভাষাটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ক্ষমতাহীন খলীফার নামেমাত্র আনুগত্যশীল মুসলিম রাজবংশকে বুঝানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হতে থাকে।[৩] তবে খিলাফত শব্দের বিকল্প হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্র পরিভাষাটি আরো আট শতাব্দী পেরিয়ে যায়।[৪]

যদিও রাষ্ট্র বা রাজনীতি শব্দদ্বয় আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়নি, তবে যে অপরিহার্য উপাদানসমূহ একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করে, সেগুলোর সুস্পষ্ট উল্লেখ আল-কুরআনে রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, পারিভাষিকভাবে উল্লেখিত না হলেও আল-কুরআন রাষ্ট্র ও রাজনীতির বিষয়গুলো আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবেই উল্লেখ করেছে।[৫] একে ইসলামী রাষ্ট্র, খিলাফত বা অন্য যে কোনো নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, এটি হবে আল-কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক। তাই আল-কুরআন এবং সুন্নাহ ভিত্তিক সংগঠিত ও পরিচালিত আদর্শবাদী রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র। এরূপ রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক মুসলমান না হলেও তা হবে ইসলামী রাষ্ট্র।[৬]

১. হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, আগস্ট ২০০০, পৃ. ৩৪৩

২. Ahmet Davutoglu, *Alternative Paradigms : The Impact of Islamic and Western Western Weltanschauung on Political Theory,* Maryland : University Press of America, 1994, p. 190

৩. আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী, *তারীখ আত-তাবারী*, সম্পাদনা : এম. জে. দি. গোয়েজি, লেইডেন : ই. জে. ব্রিল, ১৯৯১, খ. ১১, পৃ. ৮৫-১১৫

৪. Hamid Enayet, *Modern Islamic Political Thought,* London : MacMillan Press, 1981, p. 69

৫. Mazeed Kadduri, *The Nature of the Islamic State,* Islamic Culture, Vol. 21, 1947, p. 327

৬. গবেষণা বিভাগ সংকলিত *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা*, (এ জেড এম শামসুল আলম, ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর ২০০৪, পৃ. ৪২

মুহাম্মাদ স. এর প্রতিষ্ঠিত মদীনারাষ্ট্র ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ছিল। এ রাষ্ট্রে ধর্মীয় আইন রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে গৃহীত হয়। রাসূলুল্লাহ স. রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাধারণের মতামত উপেক্ষা করতেন না। জরুরি পরিস্থিতিতে তিনি জনগণের পরামর্শও গ্রহণ করতেন।[৭] মদীনা সনদের কতগুলো ধারা হতে অনুধাবন করা যায় যে, মদীনারাষ্ট্র একটি সাধারণতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে রাষ্ট্রে মুসলমান ও অমুসলমান সকলের নাগরিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। তাছাড়া গোত্রীয় প্রথা অটুট রেখে আরব ও ইহুদি গোত্রগুলোকে মদীনা সাধারণতন্ত্রে যোগদানের সুযোগ দেয়া হয় এবং আল্লাহর যিম্মা ও মুহাম্মাদ স.-এর তরফ হতে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। সে রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় অধিকার, সামাজিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক মর্যাদাবোধ, আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস এবং নবী ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মুহাম্মাদ স.-এর নেতৃত্ব স্বীকৃত ছিল। মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এ রাষ্ট্রকেই ইসলামী রাষ্ট্র নামে আখ্যায়িত করেছেন।[৮] ইসলামের সর্বজনীন ও সর্বকালীন বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথিবীর যে কোনো দেশে, যে কোনো সময়ে মুহাম্মাদ স. প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তা ইসলামী রাষ্ট্র নামেই আখ্যায়িত হবে। বলা বাহুল্য, এ রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিও হবে রাসূলুল্লাহ স. প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির অনুরূপ।

বৈদেশিক নীতি

সাধারণত বৈদেশিক নীতি বলতে বুঝায় কোনো রাষ্ট্রের জাতীয় নীতির সেই অংশ, যা বহির্বিশ্বের সাথে যুক্ত। বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রই বিশ্ব সমাজের সদস্য হিসেবে নিজের বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে সকল রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখতে বাধ্য হয়। ব্যাপকার্থে বৈদেশিক নীতি বলতে বিদেশের সাথে সম্পর্কের যাবতীয় দিককেই বুঝায়।[৯]

বৈদেশিক নীতি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জড়িত ক্রিয়াকলাপ এবং আচরণের ধরন নিয়ে বৈদেশিক নীতি গড়ে ওঠে। বৈদেশিক নীতি হলো নির্দিষ্ট আন্তঃরাষ্ট্রীয় কার্যক্রম অনুসরণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বিশেষ। বৈদেশিক নীতির মাধ্যমে যে কোনো রাষ্ট্র আন্তঃরাষ্ট্র বিষয়ক কোনো সিদ্ধান্তকে যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে থাকে। এটি বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যুক্তিযুক্ত সংবেদন বা প্রতিক্রিয়া। এর সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম জড়িত। আন্তর্জাতিক সমাজে

৭. S. A. Q. Hussaini, *Constitution of the Arab Empire,* Lahore : 1958, p. 2-4

৮. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান ও ড. শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ,* রাজশাহী : বুকস প্যাভিলিয়ান, পৃ. ১৯

৯. প্রফেসর ফিরোজা বেগম, *আন্তর্জাতিক রাজনীতি,* ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৩৩০

প্রতিটি রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের রূপরেখা বৈদেশিক নীতির প্রধান উপজীব্য। এর মাধ্যমেই কোনো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পরিবেশে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।

Padelford, Lincon & Olvey বলেন,

> Foreign Policy is the overall result of the process by which a state translates its broadly conceived goals and interests into specific course of action in order to achieve its objectives and preserve its interests.[10]
>
> বৈদেশিক নীতি হলো কোনো প্রক্রিয়ার সম্যক ফল, যার মাধ্যমে উদ্দেশ্যাবলি অর্জন ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কোনো রাষ্ট্র তার বিস্তৃতভাবে চিন্তিত লক্ষ্য ও স্বার্থকে সুনির্দিষ্ট কার্যে পরিণত করে।

বৈদেশিক নীতির মধ্যে নিহিত থাকে দীর্ঘকালব্যাপী অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে স্থায়ী স্বার্থ, যা কোনো দেশ সবসময়ই সংরক্ষণ করতে ও সেই সাথে বাড়াতে চেষ্টা করে এবং সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত কোনো ব্যাপারে ঐ দেশের নীতির বিশেষ ঘোষণা, যা সে দেশের মূল স্বার্থের সাথে জড়িত।[১১]

তাই বৈদেশিক নীতি বলতে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্পর্কে কোনো রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া, বর্তমান ও প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তের ক্রিয়া-কলাপের সমষ্টিকে বোঝায়। জাতীয় স্বার্থ, লক্ষ্য এবং লক্ষ্য পূরণের মাধ্যম এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য

সাধারণ একটি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, নাগরিকগণের জন্য উন্নতমানের জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষা, শত্রু রাষ্ট্রের তুলনায় মিত্র রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়ানো, অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করা, জাতীয় মর্যাদা সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়সমূহকে বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে।[১২] ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির এগুলো অন্যতম উপলক্ষ্য; কিন্তু মূল লক্ষ্য নয়। মূল লক্ষ্য হলো ইসলামের সর্বজনীন ও সর্বকালীন দাওয়াহ পেশ করা এবং একে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র আপাদমস্তক একটি দাঈ (আহ্বানকারী) প্রতিষ্ঠান। শাসন করা, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা, বৈষয়িক উন্নতি লাভ করা, বাতিলকে

১০. Norman J. Padelford, George A. Lincon & Lee D. Olvey, *The Dynamics of International Politics,* New York : MacMillan Publishing Co., 3rd Edition, 1976, p. 201

১১. মোঃ আবদুল হালিম, *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি,* ঢাকা : ব্র্যাক প্রকাশনা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২২৮

১২. ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, *আন্তর্জাতিক রাজনীতি,* ঢাকা : বুক সোসাইটি, সেপ্টেম্বর ২০০১ ৭ম সংস্করণ, পৃ. ২৮২-৮৩

পরাজিত করা এসবই দাওয়াতের বিস্তৃতির মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ স.-কে কী দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা থেকেও ইসলামী রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾

হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন। আপনি যদি তা প্রচার না করেন তাহলে আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না।[১৩]

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সঠিক দীনসহ সকল দীনের উপর সুপ্রকাশিত ও জয়যুক্ত করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[১৪]

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং দওয়াহ পেশের কাম্য পরিবেশ বিনির্মাণের জন্য এ রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির আরও কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন,

১. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা। যেন দাওয়াতের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মক্কার সাথে এ লক্ষ্যেই রাসূলুল্লাহ স. 'বাহ্যত পরাজয়মূলক' হুদায়বিয়া সন্ধিতে আবদ্ধ হয়েছেন। চূড়ান্তভাবে যা 'ফাতহুম মুবীনে' পরিণত হয়েছে।[১৫]

২. নির্যাতনের অবসান ঘটানো, যেন মানুষ ইসলাম গ্রহণের কারণে নির্যাতিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায় এবং সাধারণভাবে সকল মানুষ নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করে। কারণ ইসলাম মানুষকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্যই আবির্ভূত হয়েছে। মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। পৃথিবীর যে দেশে যখনই মানুষ নিপীড়নের শিকার হবে, ইসলামী রাষ্ট্র সাধ্যানুসারে তার প্রতিবিধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কারণ এটি মুসলিমদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾

১৩. আল-কুরআন, ৫ : ৬৭

১৪. আল-কুরআন, ৯ : ৩৩, ৬১ : ৯

১৫. অনেকের মতে, সূরা আল-ফাতহে উল্লেখিত 'ফাতহুম মুবীন' (আল-কুরআন, ৪৮ : ১) দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধি উদ্দেশ্য। (দ্র. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, পরিচ্ছেদ : গাযওয়াতু হুদায়বিয়াহ, হাদীস নং- ৩৯১৯)

তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছো না এবং যুদ্ধ করছো না অসহায় নারী-পুরুষ ও শিশুদের জন্য? যারা বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিমদের এ জনপদ থেকে মুক্ত করুন। আপনার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক করে দিন, আপনার নিকট থেকে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী করে দিন।[১৬]

রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগের মুতা ও তাবুক অভিযান এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিসরসহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানগণ সামরিক যে অভিযানসমূহ প্রেরণ করেছিলেন সেগুলো মূলত নির্যাতিত মানুষের মুক্তি এবং মানবতার সম্মান সুরক্ষারই প্রয়াস ছিল। এ কারণেই অভিযানসমূহে নির্যাতনকারী শাসকগোষ্ঠীর পরাজয়ের পর সাধারণ মানুষের একটি বসতবাড়ি আক্রান্ত হয়নি, একজন সাধারণ লোকও অপদস্থ হননি।[১৭]

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক পণ্য হালাল উপায়ে লাভ করার ব্যবস্থা করা। আন্তর্জাতিক বাজার তৈরির ক্ষেত্রেও এ রাষ্ট্র দা'ওয়াহকেই মুখ্য বিবেচনা করবে। এ কারণে এমন পণ্যের ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত হবে না, যার উৎপাদন, বিপণন ও ভোগ ইসলামে হালাল রাখা হয়নি। ব্যবসায় হবে এমনভাবে যে, পণ্যের সাথে সাথে ক্রেতা-বিক্রেতাগণ ইসলামী লেন-দেন, বিক্রয়-বিপণনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধারণা পাবে, পরিণামে ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী হবে। এ কারণেই দেখা যায়, রাজনৈতিকভাবে ৭১০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ইসলামের আগমন হলেও রাসূলুল্লাহ স.-এর জীবৎকালেই যে সমুদ্রপথে আগত বণিকদের মাধ্যমে তাওহীদের বাণী উপমহাদেশে পৌঁছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[১৮]

৪. জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুরক্ষা। রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনামলে পৃথিবীতে ইসলামী রাষ্ট্র ছিল একটি। এ কারণে সে সময়ে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি সুরক্ষিত রাখার প্রয়াস বিদ্যমান ছিল। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় অনেকগুলো মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে। ইসলামী আদর্শের অনুসরণে এর কোনো একটি বা কয়েকটি কিংবা সবগুলোই যদি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয় তখন সে ইসলামী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের আবশ্যকীয়

১৬. আল-কুরআন, ৪ : ৭৫

১৭. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান ও শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৯, ৮৫-৯৮

১৮. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, *বাংলায় ইসলাম* (ড. কে এম মোহসীন, ড. কাজী দীন মুহম্মদ ও ড. এম এ আজিজ সম্পাদিত *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*) ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ১৭৬

বৈদেশিক নীতি হবে, ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা। আল্লাহ তা'আলা এ ঐক্যের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। বলেছেন,

﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾

তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর দীন ধারণ কর এবং ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না।[১৯]

সুতরাং বর্তমানে সবগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো, ইসলামী বিশ্বের ঐক্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে একতাবদ্ধ করতে সামগ্রিকভাবে চেষ্টা করা।[২০]

৫. অপরাপর ইসলামী রাষ্ট্রসমূহকে প্রয়োজনের সময় সামরিক ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করার উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করা।

৬. বিশ্বের যে কোনো স্থানের সকল কল্যাণকর উদ্যোগে সাধ্য ও প্রয়োজন অনুসারে ভূমিকা রাখা। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

ভাল কাজ করা ও তাকওয়া অবলম্বনে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে কেউ কাউকে সহযোগিতা করবে না।[২১]

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি

ইসলামী শরীআতের প্রথম এবং প্রধান উৎস আল–কুরআন ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মূলভিত্তি। আল–কুরআনের নির্দেশ ও নির্দেশনা অনুসারে ভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হবে, আচরণ নিয়ন্ত্রিত হবে। এ নীতির দ্বিতীয় প্রধান ভিত্তি হবে রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ বা কর্মনীতি ও আদর্শ। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾

রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা ধারণ করো আর যা থেকে তিনি বিরত থাকতে বলেন, তা থেকে বিরত থাকো।[২২]

রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনারাষ্ট্র বৈদেশিক ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করেছে, যে আদর্শ স্থাপন করেছে নিঃসন্দেহে তা আল–কুরআনে পেশকৃত মূলনীতির বাস্তবরূপ ছিল। এ সময় বৈদেশিক নীতির যে ক্ষেত্র ও ধারাগুলো বাস্তবায়নের সুযোগ

১৯. আল–কুরআন, ৩ : ১০৩

২০. মুফতি মুহাম্মদ তকী উসমানী, *রাজনীতি : ইসলামী চিন্তাধারা*, অনুবাদ: রেজাউল করিম, ঢাকা : মাকতাবাতুত তামাদ্দুন, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ২৩৯

২১. আল–কুরআন, ৫ : ২

২২. আল–কুরআন, ৫৯ : ৭

হয়নি সেগুলোসহ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রায়োগিক পূর্ণতা সাধিত হয়েছে খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনামলে। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির তৃতীয় প্রধান ভিত্তি খুলাফায়ে রাশিদীনের বৈদেশিক নীতি ও আদর্শ। এরপর পর্যায়ক্রমে ইজমা ও কিয়াস পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে সক্রিয় থাকবে। বলা বাহুল্য, কোনো ক্ষেত্রেই তা আল–কুরআনের মূলনীতি, রাসূল স. অনুসৃত পথ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রায়োগিক বাস্তবতার চেয়ে আলাদা হতে পারবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির উপাদান

কতগুলো মৌল উপাদান দ্বারা একটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্যসমূহ নির্ধারিত হয়। সাধারণত রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, আয়তন, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, জনসমাজের সংহতি, সুদক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিল্প–কারখানা, জনসংখ্যা, মৌলিক চাহিদা পূরণে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি, গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল উৎপাদনে সক্ষমতা, আর্থ–সামাজিক বা ধর্মীয় আদর্শ, রাষ্ট্রনায়কগণের চিন্তাধারা ও আদর্শ ইত্যাদি বিষয় বৈদেশিক নীতির উপাদান হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।[২৩] এ বিষয়গুলো ছাড়া একটি রাষ্ট্রের জন্য কোনটি নিরাপদ, কোনটি ভীতিকর, কোনটি বাঞ্ছনীয় ও কোনটি বর্জনীয়, সে সম্পর্কে মানুষ জাতীয় ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হতে যে শিক্ষা লাভ করে, তাও স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতির মতো রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।[২৪] এ কারণে উল্লিখিত বিষয়গুলোও একটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা, আবহাওয়া ও জলবায়ু, আয়তন, জনসংখ্যা, আর্থ–সামাজিক অবস্থা ও জনসমাজের সংহতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন, মৌলিক চাহিদা পূরণে রাষ্ট্রের সক্ষমতা, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা, সহযোগিতা ও শত্রুতার ধারা, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনে সক্ষমতা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জাতীয় ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ও বৈদেশিক নীতির উপাদান হিসেবে গণ্য হয়; তবে এগুলো প্রাসঙ্গিক উপাদান। মূল উপাদান ইসলামী শরী'আহ, জনগণ এবং মানবকল্যাণ। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের মানসিকতা, দর্শন বা আদর্শ বৈদেশিক নীতির উপাদান হয় না। কেননা ইসলামী শরী'আতের বিধানের বাইরে এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের ভিন্ন কোনো চিন্তা, অন্য কোনো আদর্শ, নিজস্ব কোনো দর্শন থাকবে না। শরঈ বিধান অনুসারে বৈদেশিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁর ভিন্ন কৌশল থাকতে পারে; কিন্তু তা কখনোই শরী'আতের অনুমোদিত সীমা অতিক্রম করবে না।

২৩. ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, *আন্তর্জাতিক রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩–৮৪

২৪. Norman J. Padelford, George A. Lincon & Lee D. Olvey, *The Dynamics of International Politics,* ibid, p. 4-5

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মৌলিক দিকসমূহ

ইসলামী রাষ্ট্র আদর্শিক বিশ্বরাষ্ট্র, শাশ্বত সত্য ও সুন্দরের পথের আহ্বায়ক রাষ্ট্র। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রকে তাই সর্বোচ্চ সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হয় এবং এ সুসম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে হয়। এ লক্ষ্যে ইসলামী রাষ্ট্র বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করে তাতে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন, যুদ্ধ নীতি, বিশ্বশান্তির ধারণা, যুদ্ধবন্দী নীতি, সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপনীতি, যুদ্ধাস্ত্র সীমিতকরণ নীতি, কূটনৈতিক যোগাযোগ নীতি, একক ও পারস্পারিক চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি, সামরিক ঋণচুক্তি, রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নকরণ এবং বিজিত এলাকা শাসননীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচিত হয়।

১. চুক্তিপালন

চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে হোক বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হোক, ইসলাম তা পালন করার জোর তাগিদ দিয়ে থাকে। কেননা চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি পালন করা বা রক্ষা করা মানুষের প্রকৃতি-নিহিত স্বাভাবিক দাবি। ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ সবার আগে চুক্তি পালন ও ওয়াদা পূরণের শিক্ষা পেয়ে থাকে। সামষ্টিক জীবনের স্থিতিস্থাপকতার জন্য যে কোনো পর্যায়ের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসপরায়ণতা জীবনের মূলভিত্তি। প্রতিশ্রুতি পূরণ ছাড়া এ ভিত্তি রক্ষা পেতে পারে না। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন:

﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا﴾

তোমরা পারস্পরিক ওয়াদা পূরণ করো। কেননা এ সম্পর্কে তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।[২৫]

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যেয়ে যে ঘোষণা দিয়েছেন তাতেও অনিবার্যভাবে চুক্তি পালন ও ওয়াদা পূরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে। তিনি বলেছেন:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾

আর সফল হয়েছে সে সব মুমিন লোক যারা তাদের আমানতসমূহ এবং তাদের ওয়াদা পূর্ণ সতর্কতার সাথে রক্ষা করে।[২৬]

ওয়াদা পালনকারীরা আল্লাহর নিকট সম্মানিত। কুরআন মাজীদে ওয়াদা পালনকারীদের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾

তারা এমন লোক যারা আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না।[২৭]

২৫. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৪
২৬. আল-কুরআন, ২৩ : ০৮
২৭. আল-কুরআন, ১৩ : ২০

এর বিপরীতে যারা ওয়াদা ভঙ্গ করে তাদের মন্দ বলা হয়েছে। দুনিয়া এবং আখিরাতে তাদের জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয়ের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ من بَعْدِ ميثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾

যারা আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় ওয়াদা করার পর তা ভেঙে ফেলে, যে সম্পর্ক আল্লাহ রক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন সে সম্পর্ক নষ্ট করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিশম্পাত আর তাদের বাসস্থান কতই না মন্দ![২৮]

আল্লাহ তা'আলার নামে পারস্পরিক যে ওয়াদা করা হয় তা পূরণ করা আবশ্যক এবং তা ভঙ্গ করা হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

যখন তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করে একে অপরের সাথে ওয়াদা করবে, তখন আল্লাহর সে ওয়াদা পূর্ণ করবে। আল্লাহকে যামিন করে সুদৃঢ় ওয়াদা করার পর তোমরা তা ভঙ্গ কর না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন। তোমরা সে পাগল মহিলার মত হয়ো না, যে তার সূতা মজবুত করে পাকানোর পর সূতাগুলোর পাক খুলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। তোমরা একদল অন্যদলকে ধোঁকা দেয়ার জন্য তোমাদের আল্লাহর নামের শপথ ব্যবহার করে থাক, যেন একদল অন্যদলের চেয়ে লাভবান হতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ এর দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করেন। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেবেন।[২৯]

ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করা মুনাফিকের চিহ্ন। তাই কোন মুসলিম কখনো কারো সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করতে বা এর বিপরীত কাজ করতে পারে না। যেহেতু মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের নিম্নতম স্থানে[৩০] সেহেতু মুনাফিকের কোন বৈশিষ্ট্য ধারণ করা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। মুনাফিকের চিহ্ন বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি : এক. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, দুই. যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং তিন. যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় সে তা খিয়ানত করে।[৩১]

২৮. আল-কুরআন, ১৩ : ২৫
২৯. আল-কুরআন, ১৬ : ৯১-৯২
৩০. আল-কুরআন, ৪ : ১৪৫
৩১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : 'আলামাতুল মুনাফিক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৩

তা ছাড়া অন্য এক হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মুসলিমরা সর্বদা তাদের আরোপিত বা প্রণীত শর্তাবলী মেনে চলবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

মুসলিমরা তাদের শর্তের উপর অটল থাকতে বাধ্য।[৩২]

আল্লাহ তা'আলার এ সকল ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ স. এর নির্দেশনার আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র বৈধভাবে স্বাক্ষরিত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং ওয়াদা–প্রতিশ্রুতিকে যথাযথ মর্যাদা দানের ঘোষণা প্রদান করে।

২. যুদ্ধনীতি

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সাধারণত সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে ভিন্ন এলাকা বা রাজ্য দখল করে মানুষকে অধীন করা হয়। অন্য দেশের উপর আক্রমণ করে সে দেশে বাণিজ্যোপযোগী পরিবেশ তৈরি করা হয় বা সে দেশে নিজের দেশের লোকদের অবাধ উপার্জনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। সে দেশে নিজ দেশের শিল্পজাত পণ্যের বাজার তৈরি করা হয়। সে দেশে মূলধন বিনিয়োগ করে শ্রম শোষণের পথ তৈরি করা হয়। কাঁচামাল সমৃদ্ধ দেশ থেকে জ্বালানী থেকে শুরু করে হীরা–সোনা পর্যন্ত সব ধরনের কাঁচামাল আত্মসাৎ করা হয়। প্রয়োজনে যুদ্ধ তৈরির পরিবেশ রচনা করে সমরাস্ত্র বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

আল–কুরআন এ সকল কারণের কোনো একটির জন্যও অন্যদেশ বা জাতির উপর আক্রমণ পরিচালনার অনুমতি দেয়নি। এমন একটি আয়াত সমগ্র কুরআন মাজীদ খুঁজেও পাওয়া যাবে না, যাতে এ ধরনের কোনো প্রয়োজনে কোনো দেশ দখল করার আদেশ বা অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসও প্রমাণ করে, এমন উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ স. বা তাঁর সাহাবীগণ কখনো কোথাও আক্রমণ পরিচালনা করেননি। শুধু তাই নয়, বরং যে সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি রয়েছে সেসব দেশের বিরুদ্ধে একতরফাভাবে যুদ্ধ করার এবং অতর্কিতে আক্রমণ করার অনুমতিও আল–কুরআনে দেয়া হয়নি। ইসলামের যুদ্ধনীতি ব্যাখ্যা করে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ۝ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوَاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴾

[৩২]. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আকযিয়াহ, পরিচ্ছেদ : আস-সুল্‌হ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৫৯৬; হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল*, বৈরূত : আল মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খ্রি., হাদীস নং-১৩০৩

মুনাফিকরা কামনা করে, তারা যেমন কুফরি করেছে, তোমরাও যেন তেমন কুফরি কর; যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। কাজেই আল্লাহ তা'আলার পথে হিজরত করে চলে না আসা পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে ধর এবং তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই তাদেরকে হত্যা কর। তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ কর না। কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে অথবা যারা এমন অবস্থায় তোমাদের নিকট আসে যে, তাদের মন তোমাদের বিরুদ্ধে বা তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সঙ্কুচিত হয় তাদের বিষয় আলাদা। আল্লাহ চাইলে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতাবান করে দিতেন এবং তারা অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। কাজেই তারা যদি তোমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তির প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ববস্থা গ্রহণের পথ রাখেননি। এ ছাড়াও এমন কিছু লোককে তোমরা পাবে, যারা তোমাদের থেকে নিরাপদ থাকতে চায়, কাফিরদের নিকট থেকেও নিরাপদ থাকতে চায়। যখন তাদেরকে বিশৃঙ্খলা–বিপর্যয়কর কাজে আহ্বান করা হয়, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাজেই তারা যদি তোমাদের নিকট থেকে চলে না যায়, তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং বিশৃঙ্খলা–বিপর্যয় সৃষ্টি থেকে নিজেদেরকে বিরত না রাখে, তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাবে ধরবে ও হত্যা করবে। এ ধরনের লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুস্পষ্ট অধিকার আমি তোমাদেরকে দিয়েছি।[৩৩]

আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণাসমূহের তাৎপর্য হলো–

১. মুশরিক, মুনাফিক ও পরিচিত ধর্মদ্রোহী লোকদের সাথে বন্ধুত্ব জায়িয নয়।

২. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও যারা ইসলাম কবুল করবে না বা কাফির রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে চলে আসবে না তাদেরকে মুসলিমদের বন্ধু বা মিত্র মনে করা যায় না। কেননা এমন অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ ও হিজরাত করাই হলো ইসলামের পক্ষে থাকার প্রমাণ।

৩. তারা যদি তাদের অবস্থানে অনড় থাকে তাহলে তাদেরকে ধরা এবং যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই হত্যা করা যাবে। কেননা তা না হলে তারা মুমিনদেরকে

[৩৩]. আল-কুরআন, ০৪ : ৮৯-৯১

হত্যা করবে। কখনোই তারা মুমিনদের বন্ধু বা সাহায্যকারী হবে না। বরং যে কোনোভাবে তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

৪. যাদের সাথে কোনো রকমের সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত আছে তারা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক, হিজরাত করুক অথবা না করুক তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না। এমনকি কোনো মুসলিম দলও যদি তাদের সাথে মিলে যায় তাহলে তাদেরকেও চুক্তির আওতাভুক্ত ধরে নিতে হবে। কেননা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় বাস্তবসম্মত কারণে হিজরাত করা সম্ভব হয় না।

৫. যারা চুক্তিবদ্ধ লোকদের সাথে মিলিত হবে বা যারা মুমিনদের বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না বা করার সাহস নেই বরং সন্ধি করতে আগ্রহী তাদের সাথেও যুদ্ধ করা যাবে না।

৬. শান্তি চুক্তি থাকা সাপেক্ষে কাফিরদের সাথেও যুদ্ধ করা যাবে না।

৭. যারা মুমিনদের নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদেরকে মুমিন হিসেবে পরিচয় দেয় আর তাদের নিকট থেকে চলে যাওয়ার পর সুযোগ পেলেই কোনো না কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাদেরকে যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই ধরা ও হত্যা করা যাবে। কেননা তারা প্রকাশ্যে মুনাফিকী করছে এবং মুমিনদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

ইসলামী রাষ্ট্র বৈদেশিক নীতি হিসেবে তাই যে কারো সাথে যুদ্ধ বা ব্যক্তি স্বার্থে যুদ্ধ করার ধ্বংসাত্মক নীতি বর্জন করেছে। এমনকি যে মুশরিকদেরকে মুমিনদের কঠোর শত্রু ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾

আপনি সকল মানুষের মধ্যে ইহুদি ও মুশরিকদেরকে মুমিনদের প্রতি সবচেয়ে বেশি শত্রুভাবাপন্ন পাবেন।[৩৪]

সে মুশরিকদের সাথে কৃত চুক্তি পালনের ব্যাপারেও ওয়াদা পালনের তাকীদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছো এবং পরে যারা তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি পালনে কোন ভুল করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের ভালবাসেন।[৩৫]

[৩৪]. আল-কুরআন, ০৫ : ৮২

[৩৫]. আল-কুরআন, ০৯ : ৪

কিন্তু তারা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে, চুক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে কাফির–মুশরিকদেরকে বা মুমিনদের শত্রুদের সাহায্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি আছে। যেমন,

﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ﴾

তোমাদের সাথে চুক্তির পর তারা যদি তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে তাহলে কাফির প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর, কেননা এরপরে অবশ্যই তাদের সাথে তোমাদের আর কোন চুক্তি অবশিষ্ট নেই। সম্ভবত তারা বিরত থাকবে।[৩৬]

কাফিরদের সাথে স্বাক্ষরিত হুদায়বিয়া সন্ধি চুক্তি (৬২৮ খ্রি) রক্ষায় রাসূলুল্লাহ স. নযীরবিহীন ভূমিকা পালন করেছেন। এ চুক্তির একটি ধারায় লিখিত ছিলো,

> অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে কুরায়শের কেউ যদি (মক্কা থেকে) মুহাম্মাদের নিকটে (মদীনায়) চলে যায়, তবে তিনি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু মুহাম্মাদের কোন সাথী যদি কুরায়শদের কাছে চলে আসে, তবে তারা তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না।"[৩৭]

চুক্তি স্বাক্ষরের পর আবু জান্দাল রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট উপস্থিত হলেন। ইসলাম কবুল করার কারণে মক্কার কাফিররা তাকে শিকলে বেঁধে নানাভাবে নির্যাতন করছিলো। সন্ধির শর্তানুসারে কাফিররা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগলেন: হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমাকে কি মুশরিকদের হাতে পুনরায় তুলে দেয়া হবে আর তারা আমার দীন বরবাদ করবে? এ প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ স. বললেন:

يَا أَبَا جَنْدَل اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ ، فَإِنّ اللّهَ جَاعِلٌ لَك وَلِمَنْ مَعَك مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا ، إنّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا ، وَأَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَأَعْطَوْنَا عَهْدَ اللّهِ وَإِنّا لا نَغْدِرُ بِهِمْ

হে আবু জান্দাল! ধৈর্যধারণ কর এবং বিনিময়ে সওয়াবের আশা রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার এবং তোমার দুর্বল মুসলমান সাথীদের জন্য নিষ্কৃতির বন্দোবস্ত করে দেবেন। আমাদের এবং ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চুক্তির বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হয়েছি। আর এ ব্যাপারে আমরা এবং তারা আল্লাহর নামে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আর এ ব্যাপারে আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চাই না।[৩৮]

[৩৬]. আল-কুরআন, ০৯ : ১২

[৩৭]. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম মুআফিরী, *সীরাতুন নবী স.*, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০১৩ (৩য় সংস্করণ), খ. ৩, পৃ. ৩৩০

[৩৮]. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম মুআফিরী র., *সীরাতুন নবী স.*, ৩য় খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১–৩২

কারো উপর আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করা ইসলামের রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ স. তাঁর সকল যুদ্ধে অনাক্রমণ নীতি অনুসরণ করেছেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলেও এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। অপ্রস্তুত কাউকে আক্রমণ করা যেমন ইসলামের রীতি নয়, তেমনি যুদ্ধকে এড়ানোর কোনো চেষ্টাই বাদ না রাখা ইসলামের রীতি।[৩৯]

রাসূলুল্লাহ স. ও খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে যুদ্ধ শুরুর আগে শত্রুপক্ষ আলাপ–আলোচনা চালাতে প্রস্তুত থাকলে মুসলমানগণ তাতে সম্মত হতেন। এসব আলাপ–আলোচনার ফলে অনেক সময় শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হতো। যেমন ইরাক ও সিরিয়ার অনেকগুলো শহরের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আবার কোথাও কোথাও মতবিরোধের কারণে আলোচনা হঠাৎ করে ভেঙে যাওয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে। কাদিসিয়ার বিখ্যাত যুদ্ধের আগে পারসিক সেনাপতি রুস্তম ও মুসলিম সেনাপতি সাদ বিন ওয়াক্কাসের আলোচনা আকস্মিকভাবে শেষ হয়ে গিয়েছিল।[৪০]

এ সব কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে যুদ্ধের ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিধি ও প্রথা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১. সাধারণভাবে কোন দেশ, গোত্র বা জাতিকে পদানত করার জন্য যুদ্ধ করা যাবে না;
২. কোনো দেশে বাণিজ্য সুবিধা লাভের আশায় সে দেশে আগ্রাসন চালানো যাবে না;
৩. কোনো দেশে বা অঞ্চলে শিল্পপণ্যের বাজার তৈরির জন্য আক্রমণ করা যাবে না;
৪. কোনো দেশে মূলধন বিনিয়োগ করে শ্রম শোষণের জন্য আক্রমণ করা যাবে না;
৫. সমরাস্ত্র বিক্রির অশুভ ইচ্ছায় কোনো দেশে যুদ্ধাবস্থা তৈরি করা যাবে না;
৬. চুক্তিবদ্ধ পক্ষের সাথে কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধ করা যাবে না, যতক্ষণ না তারা সরাসরি চুক্তিবিরুদ্ধ কোনো কাজ করে বা চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেয়;
৭. বিনা কারণে কোন দেশ, জাতি, গোত্রে সমরাভিযান পরিচালনা করা যাবে না;
৮. যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে না, মুমিনদের ক্ষতি করার কোনো চেষ্টা করে না, মুমিনদের স্বার্থের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কাউকে বা কোনো গোষ্ঠীকে সাহায্যও করে না তারা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না;
৯. যারা মুমিনদের ক্ষতি করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বা তাদের শত্রুদের সাহায্য করে এমন কাফির, মুশরিক, ইহুদী, খ্রিস্টান যে কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে;
১০. শান্তি রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে। সবসময় যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করা হবে। কোনোভাবে এড়ানো না গেলেই কেবল চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে যুদ্ধ করা যাবে।

৩৯. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান ও ড. শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬–৩৯, ৮৫–৯৮
৪০. ইমাম আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭ হি., খ. ২, পৃ. ৩৮৯-৩৯২

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির সাথে শান্তি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইসলাম পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে তাই বিশ্বশান্তির বিষয়টি অগ্রাধিকার লাভ করে থাকে। বিশ্বশান্তির জন্য যে মানবিক আদর্শের প্রয়োজন তা রয়েছে কেবল ইসলামেই। এর বড় প্রমাণ ইসলাম শব্দটি নির্গত হয়েছে 'সিলমুন' ধাতু থেকে, যার এক অর্থ সন্ধি, সমৃদ্ধি ও শান্তি। এ শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকেই মুমিনদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।[৪১]

ইসলামী রাষ্ট্রের এ শান্তিবাদী বৈদেশিক নীতির কারণেই কোনো শত্রুও যদি শান্তি চুক্তিতে আগ্রহী হয়, তা হলে তার সাথে সন্ধির হাত মিলাতে দ্বিধা করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন,

﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

কাফিররা যদি সন্ধি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে আপনিও সন্ধি করতে আগ্রহী হবেন এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।[৪২]

কুরআনের চিরন্তন আহ্বান হচ্ছে শান্তি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য। এমনকি ক্ষুদ্র পারিবারিক পরিবেশেও শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ইসলামই করেছে। কেননা বৃহত্তর পরিসরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগে প্রয়োজন ক্ষুদ্র পরিসরে শান্তি প্রতিষ্ঠা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ আর সন্ধিই হলো সর্বোত্তম।[৪৩]

ইসলাম সকল মুমিন নর–নারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ঘোষণা দিয়েছে। তাদের মধ্যে কোনো রকম বিরোধ বা বিবাদ দেখা দিলে তা দূর করে অবিলম্বে সন্ধি করে দেয়ার আদেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। তাই তোমরা তোমাদের এ ভাইদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে সম্ভবত তোমাদেরকে দয়া করা হবে।[৪৪]

৪১. আল-কুরআন, ০২ : ২০৮
৪২. আল-কুরআন, ০৮ : ৬১
৪৩. আল-কুরআন, ০৪ : ১২৮
৪৪. আল-কুরআন, ৪৯ : ১০

এমনিভাবে মুমিনদের দুটি দল যদি বিরোধিতায় লিপ্ত হয় বা যুদ্ধ শুরু করে তাহলে অবশিষ্ট উম্মাহর দায়িত্ব হলো তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া। এমনকি প্রয়োজন হলে সীমালঙ্ঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাকে মীমাংসা মেনে নিতে বাধ্য করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

মুমিনদের দুটি দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। আর তাদের এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। আল্লাহ নিশ্চয় সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।[৪৫]

ইসলামের এ সকল আদেশ ও বিধানের পরম লক্ষ্যই হলো শান্তি রক্ষা করা, শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা যেন মানুষ পরম শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে জীবন যাপন করতে পারে। ইসলামের এ লক্ষ্য যেমন মুসলিম জনগণের মধ্যে, তেমনি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যেও নিবদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের ও যাদের সাথে আজ তোমরা শত্রুতা সৃষ্টি করে ফেলেছো তাদের মধ্যে ভালোবাসা সঞ্চার করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিমান, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়াময়।[৪৬]

বস্তুত ইসলাম মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগে শান্তি স্থাপনের পক্ষে সচেষ্ট। রাসূলুল্লাহ স. এ বিধানকে বাস্তবে অনুসরণ করেছেন এবং সমস্ত কাজ আল্লাহর দেখিয়ে দেয়া পথ ও পদ্ধতিতে সম্পন্ন করেছেন। মক্কা বিজয়কালে তিনি যে পরম মানবতাবাদীর ভূমিকা রেখেছেন তা চিরকালের ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি সেদিন সা'আদ বিন উবাদা রা.-এর হাতে পতাকা দিয়েছিলেন। সা'আদ রা. পতাকা নিয়ে সামনে এগিয়ে আবূ সুফিয়ানকে দেখতে পেয়ে বললেন,

يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تُستَحَلُّ الحُرْمَة، اليوم أذل الله قريشاً

হে আবূ সুফিয়ান! আজকে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের দিন। আজ সকল হারাম হালাল হওয়ার দিন। আজ আল্লাহ কুরায়শদের লাঞ্ছিত করেছেন।

---

[৪৫] আল-কুরআন, ৪৯ : ০৯

[৪৬] আল-কুরআন, ৬০ : ০৭

রাসূলুল্লাহ স. কাছেই ছিলেন। এ কথা শুনে তিনি সাথে সাথে বলে উঠলেন,

اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم يعظم الله فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا

না, আজকের দিন ক্ষমা ও দয়ার দিন। আজ আল্লাহ তা'আলা কা'বাকে মর্যাদান্বিত করেছেন, আজ আল্লাহ কুরায়শদেরকে সম্মানিত করেছেন।[৪৭]

শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী স. এর উদ্যোগের অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হুদায়বিয়া সন্ধি। বাহ্যিকভাবে পরাজয়মূলক এ সন্ধি তিনি শান্তি রক্ষার জন্যই স্বাক্ষর করেছিলেন। এমনকি সন্ধি স্বাক্ষরের সময় কুরায়শদের দাবি অনুসারে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ বাদ দিয়ে তিনি শুধু 'মুহাম্মাদ' লেখার ব্যাপারেও কোনো আপত্তি করেননি।[৪৮]

কুরআন মাজীদের এ সকল ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ স. এর আদর্শ অনুসরণে ইসলামী রাষ্ট্র তার বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য স্থির করবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে কোনো মূল্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণ। কখনো যদি যুদ্ধ করতে হয় বা কারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হয় তারও লক্ষ্য হবে শান্তি প্রতিষ্ঠা।

৩. কূটনৈতিক যোগাযোগ নীতি

ইসলামে কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, রাষ্ট্রদূত ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের একটা বিশেষ স্থান ও মর্যাদা রয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে একটা বিশেষ সর্তকতা ও সংরক্ষণতা। ইসলামী রাষ্ট্রে বিদেশী রাষ্ট্রের কূটনীতিকদের পক্ষে এ রাষ্ট্রের আদর্শ পরিপন্থী মত প্রকাশের স্বাধীনতাও থাকবে। কেউ যদি এমন করে তাহলে তাকে কোনো শাস্তি দেয়া বা বহিষ্কার করা যাবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে শাস্তি দেয়া হলে আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

মিথ্যা নুবুয়তের দাবীদার মুসায়লামা ইবন হাবীব (আল-কাযযাব) রাসূলুল্লাহ স. এর কাছে তার দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণ করে। প্রতিনিধিরা মুসায়লামার যে চিঠিটি বহন করে নিয়ে আসে তার ভাষ্য হলো,

مِنْ مُسَيْلِمَةَ رَسُول اللّه إِلَى مُحَمّد رَسُول اللّه : سَلامٌ عَلَيْك ؛ أَمّا بَعْدُ فَإِنّي قَدْ أُشْرِكْت فِي الأَمْرِ مَعَك ، وَإِنّ لَنَا نِصْفَ الأَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفَ الأَرْضِ وَلَكِنّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ

আল্লাহর রাসূল মুসায়লামার পক্ষ হতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। পর বক্তব্য এই যে, আমি নুবুয়তে আপনার অংশীদার। কাজেই রাজ্যের অর্ধেক আমাদের, অর্ধেক কুরায়শদের। তবে কুরায়শরা একটি সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

---

[৪৭] মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আশ-শামী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল 'ইবাদ*, খ. ৫, পৃ. ২২০

[৪৮] ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৩৪২, হাদীস নং-৩১৮৭; হাদীসটির সনদ হাসান।

এ পত্রের যারা বাহক রাসূলুল্লাহ স. তাদেরকে বলেন, "তোমরা কী বলো?" তারা বললো, তিনি যা বলেছেন, আমরাও তাই বলি। রাসূলুল্লাহ স. বললেন,

أَمَا وَاللّهِ لَوْلا أَنّ الرّسُلَ لا تُقْتَلُ لَضَرَبْت أَعْنَاقَكُمَا

শোন, দূত হত্যা যদি নিষিদ্ধ না হতো, তবে আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দিতাম।

এরপর তিনি মুসায়লামাকে লিখলেন,

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُولِ اللّهِ ، إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذّابِ : السّلامُ عَلَى مَنْ اتّبَعَ الْهُدَى . أَمّا بَعْدُ فَإِنّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتّقِينَ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে ঘোর মিথ্যাবাদী মুসায়লামার প্রতি। সালাম তার প্রতি যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। পর বক্তব্য এই যে, রাজ্য তো আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।[৪৯]

এভাবে কূটনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিষ্টাচার রক্ষা এবং কূটনীতিবিদদের সম্মান জানানোর বিধান রেখে ইসলামী রাষ্ট্র পররাষ্ট্রের সাথে সহাবস্থানের সুন্দর প্রেক্ষিত রচনা করবে।

৪. একক ও পারস্পারিক চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি

যে কোনো রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির সাথে পারস্পরিক চুক্তিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন– একপক্ষীয় চুক্তি ও দ্বিপক্ষীয় চুক্তি। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে এ ধরনের চুক্তির অস্তিত্ব আছে।

ক) একক চুক্তি : একপক্ষীয় চুক্তি অত্যন্ত সরল ও সহজ চুক্তি। একটি রাষ্ট্র কতগুলো নির্দিষ্ট ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে অপর একটি রাষ্ট্র বা স্বাধীন শক্তির সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করে এবং স্থাপিত সম্পর্ক রক্ষা করাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করে। এক পাক্ষিক চুক্তি এ প্রয়োজনেরই ফলশ্রুতি। এ জাতীয় চুক্তির অর্থ হলো চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়া, তার সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করতে আগ্রহী তা প্রমাণ করা, তার উপর কোনো ধরনের আগ্রাসন করা হবে না তার ওয়াদা করা, তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না সে প্রতিশ্রুতি দেয়া। ইসলামে এমন চুক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তাবূক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ স. যখন তাবূক পৌঁছলেন, তখন আয়লা অধিপতি ইউহান্না ইবন রু'বা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে সন্ধির প্রস্তাব দিল। রাসূলুল্লাহ স. তার

৪৯. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম মুআফিরী, *সীরাতুন নবী স.*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭২

সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন। ইউহান্না জিযিয়া কর আদায় করলো। জারবা ও আযরুহবাসীরাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং তাঁকে জিযিয়া দিল। রাসূলুল্লাহ স. তাদের জন্য নিরাপত্তানামা লিখে দিয়েছিলেন, যা তাদের কাছে রক্ষিত আছে। তিনি ইউহান্না ইবন রু'বাকে যে নিরাপত্তানামা লিখে দিয়েছিলেন, তা নিম্নরূপ:

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ هَذه أَمَنَةٌ مِنْ اللّهِ ، مُحَمّدٍ النّبِيّ رَسُولِ اللّهِ لِيُحَنّةَ بْنِ رُؤْبَةَ وَأَهْلِ أَيْلَةَ ، سُفُنُهُمْ وَسَيّارَتُهُمْ فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ لَهُمْ ذِمّةُ اللّهِ وَذِمّةُ مُحَمّدٍ النّبِيّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الشّامِ ، وَأَهْلِ الْيَمَنِ ، وَأَهْلِ الْبَحْرِ فَمَنْ أَحْدَثَ مِنْهُمْ حَدَثًا ، فَإِنّهُ لا يَحُولُ مَالُهُ دُونَ نَفْسِه . وَإِنّهُ طَيّبٌ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنْ النّاسِ وَإِنّهُ لا يَحِلّ أَنْ يُمْنَعُوا مَاءً يَرِدُونَهُ وَلا طَرِيقًا يُرِيدُونَهُ مِنْ بَرّ أَوْ بَحْرٍ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এটা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল, নবী মুহাম্মদের পক্ষ হতে ইউহান্না ইবন রু'বা ও আয়লাবাসীকে প্রদত্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। তাদের জল ও স্থলের জাহাজ ও যানবাহনের ব্যাপারে এ নিরাপত্তা প্রযোজ্য। তাদের জন্য আল্লাহ ও নবী মুহাম্মদের যিম্মাদারী সাব্যস্ত হলো। শাম, ইয়ামান ও সমুদ্র দ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে থাকবে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে কেউ কোনো অঘটন ঘটালে তার অর্থ–সম্পদ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। যে ব্যক্তি তা দখল করবে, তার তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তারা যে কোনো পানি ব্যবহার করতে চাইবে এবং জল–স্থলের যে কোনো পথে যাতায়াত করবে, তাতে তাদেরকে বাধা প্রদান করার অবকাশ থাকবে না।[৫০]

এ নিরাপত্তা পত্রে রাসূলুল্লাহ স. চুক্তিবদ্ধ লোকদের জন্য সব সময় ও সকল অবস্থায় পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়ার ঘোষণা দিলেন। তাদের বেঁচে থাকার ও জীবন যাপনের পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নিলেন। তাদের নিকট থেকে কোনো জওয়াবী প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি গ্রহণ না করেই তিনি তাদের চলাচলের পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন।

খ) দ্বি–পাক্ষিক চুক্তি : এ ধরনের চুক্তি দু রকম হতে পারে। প্রথমত তাতে উভয় পক্ষই কতিপয় নেতিবাচক শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নেয়। যেমন উভয় পক্ষ এ ওয়াদা করলো যে, তাদের কোনো পক্ষই অপর পক্ষের জন্য কোনো ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি করবে না, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত কখনো এমনও হয় যে, উভয় পক্ষই কতিপয় ইতিবাচক বিষয়কে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নেয়। যেমন পারস্পরিক ব্যবসায়, বৈদেশিক বাণিজ্য, সংস্কৃতি বিনিময় ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ স. এর বৈদেশিক নীতিতে এ দু'রকম পারস্পরিক চুক্তিরই দৃষ্টান্ত রয়েছে। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে দ্বি–পাক্ষিক বা পারস্পরিক চুক্তির বিধিব্যবস্থা থাকবে।

৫০. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৪

৫. বিজিত এলাকা শাসননীতি

প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যখন কোনো দেশ অন্য কোনো দেশ জয় করে তখন বিজয়ী দেশ বিজিত দেশে ধ্বংস, হত্যা, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতনসহ যে কোনো ধরনের অন্যায় অত্যাচার চালাতে দ্বিধা করে না। এ দিকে ইঙ্গিত করে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾

সে (সাবার রাণী) বলল, 'রাজা–বাদশাহরা যখন কোন এলাকা দখল করে তখন তাকে ধ্বংস করে দেয় এবং সেখানকার মান্যগণ্য লোকদের অপদস্থ করে। এরাও এমন আচরণই করবে।[৫১]

কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র এমন নীতি অনুসরণ করতে পারে না। নবী স. এবং খুলাফায়ে রাশিদীন যখন কোনো উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন, তখন অত্যন্ত তাকীদ দিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন প্রথম খলীফা আবূ বাকর সিদ্দীক রা. ৬৩২ হিজরী সালে রাসূলুল্লাহ স.-এর ওফাতের ১৯ দিন পরে উসামা রা.-এর নেতৃত্বে শাম অভিযানে সৈন্যবাহিনী পাঠানোর প্রাক্কালে তাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত মূল্যবান দশটি নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

يا أيها الناس قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عني لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا اندفعوا باسم الله أفناكم الله بالطعن والطاعون

হে লোক সকল, তোমরা একটু থামো। আমি তোমাদেরকে দশটি অসিয়্যাত করবো। তোমরা এগুলো স্মরণ রাখবে। ১. বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং গানীমাতের মালে খিয়ানাত করবে না। ২. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না। ৩. শত্রুদের হাত পা কেটে বিকৃত করবে না। ৪. শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদেরকে হত্যা করবে না। ৫. কোনো খেজুর বৃক্ষ উপড়ে ফেলবে না এবং জ্বালাবেও না। ৬. কোনো ফলের বৃক্ষ কর্তন করবে না। ৭. কোনো বকরী, গাভী ও উট খাবার প্রয়োজন ছাড়া যাবহ করবে না। ৮. যাত্রাপথে তোমাদের সাথে এরূপ লোকের সাক্ষাৎ হবে, যারা তাদের জীবনকে ইবাদাতখানার মধ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে, তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে। ৯. এরূপ লোকের সাথেও তোমাদের সাক্ষাৎ হবে, যারা তোমাদের জন্য বিভিন্ন খাবার নিয়ে আসবে, যখন তোমরা ঐ খাবার খাবে,

[৫১.] আল-কুরআন, ২৭ : ৩৪

তখন অবশ্যই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। ১০. এরূপ লোকের সাথেও তোমাদের সাক্ষাত হবে, যারা নিজেদের মাথার মধ্যাংশকে পাখির বাসার ন্যায় পরিণত করে এবং তার চতুষ্পার্শ্বে পাগড়ির মতো কাপড় ফেলে রাখে, তাদেরকে তোমরা তরবারি দিয়ে আঘাত করবে। যাও, আল্লাহর নামে অগ্রসর হও। আল্লাহ তোমাদেরকে শত্রুদের বর্শা ও মহামারী থেকে রক্ষা করুন।[৫২]

মুসলিম বাহিনী এ আদেশ পূর্ণভাবে পালন করেছেন। এ জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বাহিনী যখন কোনো জনপদ দখল করেছে, জনপদের অধিবাসীরা হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। কোথাও যুদ্ধ ছাড়া এক ফোঁটা রক্তপাতের ঘটনা ঘটানো হয়নি। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্র বিজিত এলাকায় ইসলাম সম্মত শাসন প্রবর্তন করবে। কাউকে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করবে না। যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করবে স্বাগত জানাবে। যারা করবে না তাদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তবে কোনো অমুসলিম এমনকি কোনো মুসলিমও যদি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতেও এ রাষ্ট্র কোনো রকমের উদারতা বা দয়া দেখাবে না।

উপসংহার

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্র এক আদর্শিক বিশ্বরাষ্ট্র। এর বৈদেশিক নীতি এই আদর্শের ভিত্তিতেই প্রণীত হয়। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্র পরমত সহিষ্ণুতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সর্বাধিক কল্যাণকামিতার ভিত্তিতে এর বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করে। কারণ মানুষকে শাসন করা এ রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয়। এর লক্ষ্য মানুষের দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করা। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিও এ লক্ষ্যেই প্রণীত হয়। তাই একুশ শতকের বিশ্বায়নের এ যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি আধুনিক যে কোনো কল্যাণ রাষ্ট্রের অনুসরণীয় আদর্শে পরিণত হতে পারে, চাই রাষ্ট্রটি মুসলিম বা অমুসলিম, ধর্মভিত্তিক বা ধর্মনিরপেক্ষ যে ধরনের রাষ্ট্রই হোক না কেন। মনে রাখতে হবে, ইসলামের নীতি ও রাসূলুল্লাহ স. এর আদর্শ সমগ্র মানবতার জন্য এবং সকল যুগের জন্য এসেছে।

উল্লেখ্য যে, কোন মুসলিম দেশের অনুসৃত বৈদেশিক নীতি দেখে ইসলামের বৈদেশিক নীতি অনুমান করা ঠিক নয়; বরং কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের আদর্শ দেখে ইসলামের বৈদেশিক নীতি জানতে হবে।

[৫২.] ইমাম আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৬; বিস্তারিত দেখুন: ড. আহমদ আলী, *খালীফাতু রাসূলিল্লাহ আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক রা.*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩-৪১০